ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(বর্ধিত সার-সংক্ষেপ)

৩০ ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মু. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মোহাম্মদ নূরে আলম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মো: নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

তমালিকা পাল, রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

বনখাত ও বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটিসহ বিভিন্ন ইউনিটের সহকর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের সহকর্মী মো. মাহ্‌ফুজুল হক এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের নিহার রঞ্জন রায় ও ফাতেমা আফরোজ এর প্রতি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরনো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

s

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(বর্ধিত সার-সংক্ষেপ[১])

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

পরিবেশের সুষম ভারসাম্য রক্ষাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বন। বন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান প্রায় তিন শতাংশ এবং প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘের ১৫তম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[২] এছাড়াও 'দি কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি'র অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদ তথা বন সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বনভূমি সংরক্ষণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে- রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে। 'জাতীয় বন নীতি ২০১৬' ও 'বন মহা পরিকল্পনা ২০১৭-২০৩৬' এবং 'সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০' এ বন, বনভূমি ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশের বন ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। বন অধিদপ্তর তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বন সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এছাড়াও বন ও জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন সম্প্রসারণ, অবক্ষয়িত বন পুন:বনায়ন, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব 'বন অধিদপ্তর' এর ওপর ন্যস্ত। বর্তমানে বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৬ লাখ ৫২ হাজার ২৫০ একর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১২.৭৬ শতাংশ। বাংলাদেশে অপরিকল্পিতভাবে বনের জমিতে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে বন সংকোচন অব্যাহত রয়েছে। গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ এর তথ্যমতে, ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫০ একর এলাকার বৃক্ষ আচ্ছাদন হ্রাস পেয়েছে যা মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার নয় শতাংশ। বন উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার পেছনে বনকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ভূমিকাই প্রধান।

বন ও বনজ সম্পদের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক হিসেবে বন অধিদপ্তরের ভূমিকা ও কার্যকরতা প্রশ্নবিদ্ধ। গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধনসহ গণমাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি, বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বন সংক্রান্ত নীতিমালা, মহাপরিকল্পনা ও শুদ্ধাচার কৌশল থাকা সত্ত্বেও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে। ফলে বন অধিদপ্তরকে বন রক্ষায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত একটি গবেষণায় (২০০৮) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বন ব্যবস্থাপনা অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র প্রতিফলিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এসকল চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো- (১) বন অধিদপ্তরের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; (২) বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং (৩) বন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

---

[১] ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রকাশিত "বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

[২] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ (স্থলজ জীবন): স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে গবেষণা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য মূলত প্রত্যক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৬০টি কার্যালয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত দু'টি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, যথা- বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বনের প্রকারভেদ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত বন অধিদপ্তরের কার্যালয়গুলোর ধরন, যেমন- প্রধান বন সংরক্ষক এর দপ্তর/সদর দপ্তর, বন সংরক্ষক এর দপ্তর, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর, রেঞ্জ অফিস, বিট অফিস, ফাঁড়ি/ ক্যাম্প ও চেক স্টেশন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশের চার ধরনের বনাঞ্চলই অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, দেশের বনভূমির অবস্থান ও বৈচিত্র্যগত গুরুত্ব বিবেচনায় চার ধরনের বন/বনাঞ্চল রয়েছে, যথা- ১. ক্রান্তিয় চিরসবুজ বন বা পাহাড়ি বন; ২. ক্রান্তিয় আর্দ্র পাতাঝরা বন বা শালবন; ৩. প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন; ৪. সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন বা সৃজিত উপকূলীয় বন।

৩.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা ও যাচাই করা হয়েছে। গবেষণায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছ থেকে মোট ১৩০ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বনে বসবাসরত আদিবাসী, বননির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বনায়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে ছয়টি দলগত আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়সহ ৬০টি কার্যালয়কে গবেষণায় সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তাছাড়া বন আইন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি হতে ২০২০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

৩.২ বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশক এবং উপ-নির্দেশকগুলো নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৩: সুশাসনের নির্দেশক ও উপ-নির্দেশকসমূহ

গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশক	উপ-নির্দেশকসমূহ
সক্ষমতা	▪ **আইনি:** সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি
	▪ **প্রাতিষ্ঠানিক:** আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	▪ তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
জবাবদিহিতা	▪ তদারকি, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	▪ বন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বনজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি
সুরক্ষা	▪ বনভূমি সুরক্ষা ও জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার
দুর্নীতি ও অনিয়ম	▪ দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

৩.৩ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তথ্যের ধারাবাহিকতা, সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য একই তথ্য একাধিক উৎস ও বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায় হতে গুণবাচক তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষ তথ্যের যথার্থতা যাচাই করার জন্যও বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য বন অধিদপ্তর ও অন্যান্য অংশীজনের সকল পর্যায়ে ও সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

৪. গবেষণার ফলাফল

৪.১ আইনি সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ

৪.১.১ বন আইন ১৯২৭: প্রায় ৯৩ বছরের পুরোনো এই আইনে বনের সংজ্ঞা, বনের ধরন, বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন কাজে বনের জমি ব্যবহার ও বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে আইনে কিছু উল্লেখ নেই, এ সংক্রান্ত বিধিমালাও অনুপস্থিত। সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংরক্ষিত বনের মর্যাদা রহিতকরণের সুযোগ (ধারা ২৭) রাখা হলেও এক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কী প্রক্রিয়ায় রহিত করা হবে তা আইনে অনুপস্থিত; ঢালাওভাবে বনভূমি ব্যবহারের সুযোগ বিদ্যমান। বনভূমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় রূপরেখা থাকলেও অবক্ষয়িত ও বেদখলকৃত বন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই, এ সংক্রান্ত বিধিও নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও এ সংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ বিধিমালা অনুপস্থিত। প্রতিবেশি দেশসমূহ বন আইনের ঘাটতি পূরণে সম্পূরক আইন প্রণয়ন করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যেমন- ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট, ইত্যাদি করা হয় নি।

৪.১.২ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২: সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীর প্রতিবেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও তা সুরক্ষায় কী করা হবে তা আইনে উল্লেখ নেই এবং এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কোনো বিধানও রাখা হয় নি। অপরাধ সংঘটনকালে কিংবা অপরাধের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ/আলামত থাকা সত্ত্বেও আদালতের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘটনাস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করার ক্ষমতা বন অধিদপ্তরের নেই। বন্যপ্রাণী হত্যা, চুরি ও চোরাচালানের ঘটনা তদন্ত কে করবে তাও আইনটিতে উল্লেখ নেই। এছাড়া বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে হিসেবে ঘোষিত বনসমূহে বিনা অনুমোতিতে প্রবেশ বা অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা (ধারা ১৫) অমান্য করার শাস্তি বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী আইনে প্রদত্ত বিনা পরোয়ানায় আটকের ক্ষমতা এই আইনে (২০১২) রহিত করা হয়েছে।

৪.১.৩ করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০১২: বিধি ৭(ক) এ পৌর এলাকায় করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার সুযোগ থাকায় সংরক্ষিত বনের পাশ বা মধ্যে অবস্থিত পৌর এলাকায় করাত-কল স্থাপন করে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনের গাছ চুরির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা ২০১২ এর বিধি ১২ অনুযায়ী শাস্তি প্রদনের ক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘনকারীকে অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড ও এর অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান বন ও পরিবেশের ক্ষতির তুলনায় নগন্য।

৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৪.২.১ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক বরাদ্দ: বনখাত হতে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বেধে দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা বন রক্ষায় অন্যতম একটি অন্তরায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাজস্ব সংগ্রহ কেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়মের সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। রাজস্ব আহরণের নামে বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দুর্নীতিতে, যথা- প্রাকৃতিক বন কেটে সামাজিক বনায়ন, রাবার বাগান তৈরি, ইকো-ট্যুরিজম, ইজারা প্রদান, জমি লিজ, কাঠ বিক্রয়, ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে। কাঠ বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দ্রুত বর্ধনশীল কিন্তু প্রাকৃতিক বন এবং স্থানীয় পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন করা হয়। বনায়ন বন অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ অনুপস্থিত, যেমন- বাগান সৃজন/বনায়ন কাজে গাছ প্রতি বরাদ্দ বর্তমানে ১৭ টাকা অথচ এই কাজে গাছপ্রতি ন্যূনতম ২৫-৩০ টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ নেই; রিটেইনার ফি বাবদ (আইনজীবীদের ভাতা) ন্যূনতম বরাদ্দ নেই। উল্লেখ্য, নিম্ন আদালতে মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস ও মাসিক ফি যথাক্রমে ১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা ও ১,৫০০ টাকা বরাদ্দ যা, বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

৪.২.২ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস: বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে অত্যাবশ্যক অবকাঠামো, যেমন- দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য কক্ষ, বসার জায়গা ও আসবাবপত্রের সংকটের কারণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় পরিত্যক্ত ভবন/ঘরে বনকর্মীরা দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করে। জব্দ ও উদ্ধারকৃত বনজসম্পদ এবং বন মামলার আলামত সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব সংরক্ষণাগারের অনুপস্থিতি রয়েছে। ফলশ্রুতিতে জব্দ ও উদ্ধারকৃত গাছ ও কাঠ অনির্দিষ্টকাল উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখায় তা নষ্ট হয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতির উদাহরণ রয়েছে। মাঠ কার্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধা, যেমন- কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যাণ্ড ইন্টারনেট সংযোগের ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতির কারণে দপ্তরের বাইরে থেকে কম্পোজ, প্রিন্ট ও ফটোকপি করায় দাপ্তরিক গোপনীয় তথ্য ও নথি ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

৪.২.৩ আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা: বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হয় নি, যেমন- সার্ভেলেন্স ড্রোন, ট্রাকিং ডিভাইস, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস), স্যাটেলাইট ইমেজ, ইত্যাদির ঘাটতি। বনভূমির জমির দলিল, রেকর্ডপত্র ও মানচিত্র, মামলার আলামত, ইত্যাদি এখনও সনাতন পদ্ধতিতে (পেপার-ভিত্তিক) সংরক্ষণ করায় সেগুলো বিনষ্ট, চুরি ও হারিয়ে যাওয়ায় বনভূমি জবরদখলের ঝুঁকি/সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও রেঞ্জ ও অধস্তন কার্যালয়গুলোর কর্মীদের বেতন-ভাতা ও সকল প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক না হওয়ায় নগদে অর্থ প্রদানকালে বণ্টনকারী কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে রেখে দেওয়ার সুযোগ থাকে। এছাড়া বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে প্রায়শ বনকেন্দ্রিক অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে বন কর্তৃপক্ষের নজরের আসে না, কিংবা কর্মীদের একাংশ তা এড়িয়ে যায়।

৪.২.৪ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা: বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন - রিমোট সেনসিং) ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত উদ্যোগের অনুপস্থিতি রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে অধিদপ্তরের একাংশের মধ্যে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের চাকরি হারানো ভীতির পাশাপাশি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ ও জবাবদিহিতার ঘাটতি বিদ্যমান। গতানুগতিক বন ব্যবস্থাপনাকে (যথা- বন টহল) বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান জনবলের (১০,৩২৭টি) প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধিসহ অধিদপ্তরের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামো (১৭,৮২০টি) অনুমোদনের জন্যে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো অনুমোদন করা হলে বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত কোনো পরিবর্তন না হওয়া এবং বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের ঘটনা অব্যাহত থাকার ঝুঁকি রয়েছে। এভাবে সনাতন পদ্ধতিতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উচ্চ ব্যয় এবং বনকেন্দ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির উচ্চ ঝুঁকি ও সুযোগ বিদ্যমান। প্রতিবেশি দেশ ভারতসহ উন্নত দেশসমূহের ন্যায় বিজ্ঞানভিত্তিক (যেমন - রিমোট সেনসিং এর কার্যকর প্রয়োগ) বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও এর কার্যকরা গেলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় ও বনকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৩ স্বচ্ছতা

৪.৩.১ তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার: তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিরাজমান। সংরক্ষিত বনভূমির জমি বৃহৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহারের অনুমতি/ সম্মতি প্রদান সম্পর্কিত বন অধিদপ্তরের অবস্থান ও মতামত সংক্রান্ত নথি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দেওয়া ও জবরদখল হওয়া বনভূমির পরিমাণের ওপর মাঠ জরিপভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নেই। ওয়েবসাইটে পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুপস্থিত। প্রতিবছর বনভূমির কী পরিমাণ জমি জবরদখল হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে তা প্রকাশ করা হয় না। রেঞ্জ, বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি, ক্যাম্প, ইত্যাদি কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করা নেই। প্রধান বন সংরক্ষক, বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় সম্পর্কিত নাগরিক সনদ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও এসবে বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম উল্লেখ করা নেই। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অভিযোগ গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর প্রদর্শন করা নেই।

৪.৪ জবাবদিহিতা

৪.৪.১ তদারকি ও পরিবীক্ষণ: মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত হয়। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে শুধু প্ল্যান্টেশন/সৃজিত বাগান সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (যতদিন পর্যন্ত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ থাকে) পরিবীক্ষণ করা হয়। রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ে কোথায় কী হচ্ছে তা বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে (ডিএফও) নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ও ডিএফও কর্তৃক তা আমলে নেওয়া হয়। এছাড়াও প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় প্রকল্পের কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, একটি বিট এলাকায় বন সৃজন প্রকল্পের বনায়ন কাজ এক তৃতীয়াংশও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা না হলেও জরিপ প্রতিবেদনে ৮০ শতাংশের অধিক হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া তদারকি ও পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতির অভিযোগ আমলে নেওয়ার উদাহরণ বিরল।

৪.৪.২ নিরীক্ষা: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় এবং সদর দপ্তর হতে বিভাগীয় বন কার্যালয় পর্যন্ত নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সিএজি'র কিছু পর্যবেক্ষণ ও আপত্তির ধরনে দেখা যায়- বিক্রীত গাছের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ না করায় আর্থিক ক্ষতি,

অনাদায়ী টাকা, মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও কর্তন না করা, অর্থ অপচয়, ইত্যাদি আপত্তিগুলো উঠে আসলেও তা আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত বিরল। এছাড়াও সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ মোতাবেক সকল বনকর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বা প্রকাশ করা হয় না।

৪.৪.৩ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: বন অধিদপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ঘাটতি বিদ্যমান, যেমন- বনকর্মী ও অংশীজন হতে

বক্স ১

"নিরীক্ষা দলের সদস্যদের বন অধিদপ্তরের মতো একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ওপর নিরীক্ষা করার মতো কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করা যায়। একটি অর্থবছরে কী পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছে; রেঞ্জ ও বিট-ভিত্তিক জবরদখল হওয়া বনভূমির পরিমাণ ও জবরদখলকারী, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। সনাতন নিরীক্ষা পদ্ধতি দাপ্তরিক নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক হওয়ায় তা দ্বারা বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের গুণগত মানের প্রকৃত চিত্র তুলে আনা সম্ভব নয়। বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে 'ফরেস্ট্রি পারফরমেন্স অডিট' সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক।" (সূত্র:একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য)

বন অধিদপ্তর ও এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনলাইন, ফোন কল (ল্যাণ্ড ফোন) ও প্রচলিত পদ্ধতিতে (লিখিত ও সরাসরি) অভিযোগ গ্রহণ/দাখিলের ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কাজ করছে না। এছাড়াও অভিযোগ জানানোর প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণে অধিদপ্তরের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। অধিদপ্তরের একজন/কোনো কর্মী অপর কর্মী সম্পর্কে অভিযোগ করলে ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে দুর্ব্যবহার ও তিরস্কার করা, বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আটকানো, এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি, ইত্যাদির উদাহরণ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের কাছে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি; উক্ত সময়ে পূর্বের অনিষ্পন্ন ১৫৩টি অভিযোগের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৬টি (৪%) অভিযোগ। তাছাড়া গণশুনানি আয়োজন না করা এবং এ ব্যাপারে বন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান।

৪.৫ অংশগ্রহণ

৪.৫.১ বননির্ভর আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে সুবিধাভোগী হিসেবে স্থানীয় বন-নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালীদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; 'কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার' হিসেবে প্রকৃত সুবিধাভোগী বিশেষ করে ঐতিহ্যগতভাবে বনের জমিতে বসবাস ও কৃষি আবাদকারী ব্যক্তিদের সুযোগ দেওয়া হয় না। এছাড়া বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক নিজেদের ইচ্ছামাফিক সামাজিক বনায়নের উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করার অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ২

সম্প্রতি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) টাঙ্গাইল বন বিভাগ মধুপুর উপজেলার অরণখোলা মৌজায় একটি আদিবাসী পরিবারের বংশ পরম্পরায় চাষাবাদকৃত জমি (৪০ শতক) হতে জোরপূর্বক উচ্ছেদ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। উক্ত উচ্ছেদ অভিযানের আগে সংশ্লিষ্ট চাষীকে অবহিত করা হয় নি। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের সাথে বনকর্মীদের একাংশের বিধিবহির্ভূত লেনদেনের সম্পর্ক থাকায় একই মৌজায় প্রভাবশালীদের জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেই।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, বন-নির্ভর আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত ভূমি অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভূমির অধিকার হতে বঞ্চিত করার উদাহরণ রয়েছে। স্থানীয় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মতামত, পরামর্শ বা সম্মতি না নিয়ে সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, ইকো পার্ক ও বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, ইত্যাদি বাস্তবায়নের ফলে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত অধিকারকে হরণ করা হচ্ছে। বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার ও ন্যায়সঙ্গতভাবে তা প্রয়োগ না করার উদাহরণ রয়েছে। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলকৃত ভূমি হতে আদিবাসীদের জোরপূর্বক উৎখাত করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের ও জোর করে উচ্ছেদ করা হয়। বন অধিদপ্তর কর্তৃক বনবাসীদের বিরুদ্ধে কয়েক হাজার ভুয়া মামলা

দায়েরের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান ও আবাসনের ব্যবস্থা না করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, সেনানিবাস ও সামরিক স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি বনের জমি বরাদ্দ প্রদান করায় বনে বসবাসরত আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৬ বন সুরক্ষা

সরকারি বনভূমি সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বন অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে রামপাল কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে বলে চিঠি মারফতে উল্লেখ করলেও পরিবেশগত প্রভাব যাচাইয়ের (ইআইএ) পর বন অধিদপ্তর উক্ত প্রকল্পের আর বিরোধিতা করে নি। উল্লেখ্য, পরিবেশ অধিদপ্তরও প্রকল্পটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আপত্তি জানায়। এছাড়া ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ এবং সুন্দরবনের জন্য প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হলেও বন অধিদপ্তর প্রকল্পটির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া বন্যহাতিসহ বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানসমূহের (যথা- ডুলাহাজরা ও মেধাকচ্ছপিয়া) মধ্য দিয়ে দোহাজারী-গুণদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে অধিদপ্তরের সম্মতি জ্ঞাপন সংস্থাটির উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের উদাহরণ।

সরকারি বনভূমি সুরক্ষা বন অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে প্রতিষ্ঠানটির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা প্রয়োগ না করা, যেমন- বনের জমিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে অভিযান পরিচালনা, মামলা দায়ের, ইত্যাদি না করে শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, কক্সবাজার জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বনের অবৈধ স্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ প্রদান; মহেশখালী ও মাতারবাড়িতে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প সংলগ্ন উপকূলীয় শ্বাসমূলীয় বন, নদী ও সাগরে প্রকল্পের বর্জ্য ও মাটি ফেলা এবং পাহাড় কেটে প্রকল্পের জমি ভরাট করা হয়েছে; তাছাড়া মহেশখালীতে ১৯২ একর সংরক্ষিত বনভূমির গাছ উজাড় করে অপরিশোধিত তেলের ডিপো ও পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে বন বিভাগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/বিভাগকে আপত্তি জানানোয় ঘাটতি রয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণকালে দুই হাজারের অধিক গর্জন গাছ কর্তনসহ উক্ত প্রকল্পে নিকটস্থ পাহাড় ও বনভূমির মাটি ব্যবহাররোধে অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি ছিল। সাঙ্গু ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে সড়ক নির্মাণ; টাঙ্গাইলে শালবনের মধ্য দিয়ে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন; রামগড়-সীতাকুণ্ড সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ইত্যাদি কার্যক্রম বন সুরক্ষার বিপরীতে বন ধ্বংসের উদাহরণ বিদ্যমান থাকলেও বন অধিদপ্তর এ সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর কর্তৃক শুধু লিখিতভাবে আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ রয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত বনভূমির প্রায় এক লক্ষ ৬০ হাজার ২৪০ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ করে নিয়ে গেছে। মধুপুর উপজেলা শালবনের ভেতরে ৩০৫ একর এলাকাজুড়ে বিমান বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। রামু ও রুমা উপজেলায় সেনানিবাস স্থাপন দ্বারা বন্য হাতির অভয়ারণ্য বিপন্ন করা হয়েছে এবং সিতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলার সংরক্ষিত বন এবং সোনাদিয়া দ্বীপে বিশেষ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করার ফলে বন ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছে।

৪.৭ বনভূমি পুনরুদ্ধার

২০১৯ সালের ডিসেম্বর অবধি মোট ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি জবরদখল করা হলেও অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ পাঁচ বছরে মাত্র ৮ হাজার ৭৯২ একর (৩%) জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারের পরিমাণ কম হওয়ার পেছনে বন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এক্ষেত্রে জমির দলিল ও নথিপত্র অধিদপ্তরের কাছে চূড়ান্ত অবস্থায় না থাকা ও উদ্যোগের অভাব ছিল। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য মতে, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ইত্যাদি জেলাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবরদখলে থাকা বনভূমির জমি দখলমুক্তকরণ ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে অধস্তনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বন কার্যালয়গুলো কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য তৎপর না হয়ে শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকা এবং জবরদখলকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শুধু চিঠি আদান-প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকার উদাহরণ রয়েছে। তাছাড়া বনকর্মী কর্তৃক অনৈতিক সুবিধা ও দুর্নীতির মাধ্যমে বনের জমিতে অর্থকরী ফসল আবাদ অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আইনপ্রণেতা, জনপ্রতিনিধি,

প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশের সহায়তা না পাওয়া এবং বাধা ও চাপের সম্মুখীন হতে হয়।

৪.৮ দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

৪.৮.১ ক্ষমতা অপব্যবহার: বিভিন্ন ক্ষেত্রে বনকর্মীদের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহার ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগে ঘাটতি বিদ্যমান। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য মতে, বদলি নীতিমালা উপেক্ষা করে বনকর্মীদেরকে নিজ জেলায় বদলি ও পদায়ন করা হয়। বদলির আদেশ জারির পরও অনির্দিষ্টকাল একই কার্যালয়ে কর্মীদের রেখে দেওয়া হয়। গাজীপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ও তিনটি পার্বত্য জেলায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। জমির দাগ ও খতিয়ানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য সংযোজন করে তা জবরবদখলের সুযোগ প্রদানের উদাহরণ রয়েছে। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার আওতাধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এসবের চর্চার আধিক্য দেখা গিয়েছে। মধুপুর ও কালিয়াকৈর উপজেলার সংরক্ষিত বনের জমিতে জনসাধারণকে অর্থকরী ফসল আবাদের সুযোগ দিয়ে বছরভিত্তিক বিধিবহির্ভূতভাবে একর প্রতি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, অবৈধ বনজ সম্পদ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি, আটক ও জব্দ না করতে অধস্তন বনকর্মীদের নির্দেশ প্রদান এবং তা অমান্য করলে অন্যত্র বদলিসহ চাকরিতে হয়রানির অভিযোগ রয়েছে।

৪.৮.২ যোগসাজশ: বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে বনকর্মীদের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট ও সাব-রেজিস্টার অফিসের কর্মী ও বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে ভুয়া দলিল ও নথি তৈরি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্তির উদাহরণ রয়েছে। সামাজিক বনের প্লট তৈরিতে প্রাকৃতিক বন (শাল, গর্জন ও গজারি) স্থায়ীভাবে উজাড় ও তা দখলের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। সরকারি বনভূমির সীমানা হতে ন্যূনতম ১০ কিলোমিটারের মধ্যে করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৭ক, করাত-কল লাইসেন্স বিধিমালা ২০১২) উপেক্ষা করে করাত-কল স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। সখীপুর ও ঘাটাইল উপজেলার আওতাধীন সংরক্ষিত বনে যথাক্রমে প্রায় অর্ধশতাধিক ও শতাধিক অবৈধ করাতকলের অস্তিত্ব থাকলেও অধিদপ্তর কর্তৃক তা উচ্ছেদে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি বিদ্যমান। তাছাড়া বনকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে অবৈধ বনজসম্পদ, যেমন- বাঘ, কুমির, হরিণের মাংস, কাঠ, ইত্যাদি আটক করার পরও পাচারকারীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে গোপনে ছেড়ে দেওয়া কিংবা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৮.৩ বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেন: গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি/পদায়নের একাংশের ক্ষেত্রে বিধিবর্হিভূত অর্থ লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, পদ, কর্ম এলাকা বিশেষ করে অবৈধভাবে বনজ সম্পদ বিক্রি করার সুযোগ ও জমির উচ্চমূল্য ইত্যাদি বিবেচনায় 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকায় বদলির জন্য বনকর্মীদের একাংশের মধ্যে দরকষাকষি ও উচ্চ পর্যায়ে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতাভেদে অবৈধ অর্থের লেনদেনের পরিমাণে তারতম্য হয় (সারণি ১)।

সারণি ১: নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি/পদায়নে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন

পদ*	লেনদেনের ক্ষেত্র	টাকার পরিমাণ	অর্থের গ্রহিতা
প্রধান বন সংরক্ষক	পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ	১ - ৩ কোটি	মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও ব্যক্তিগত সহকারী এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
বন সংরক্ষক	নিয়োগ ও বদলি	২০ - ২৫ লক্ষ	
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পদোন্নতি/বদলি	১০ লক্ষ - ১ কোটি	
প্রকল্প পরিচালক	নিয়োগ/পদায়ন	১ - ১.৫ কোটি	
সহকারী বন সংরক্ষক	বদলি	১ - ৫ লক্ষ	
রেঞ্জ কর্মকর্তা	বদলি	৫ - ১০ লক্ষ	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় বন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ
চেক স্টেশন-ইন-চার্জ	বদলি	১০ - ২৫ লক্ষ	
ফরেস্টার	বদলি	১০ - ২৫ লক্ষ	
বিট কর্মকর্তা	বদলি	২ - ৫ লক্ষ	
বন প্রহরী	বদলি	০.৫ - ২.৫ লক্ষ	

*প্রদত্ত তথ্য সকল পদ, কর্মী ও সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক বিধিবর্হিভূত অর্থ আদায় করা হয়। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামাজিক বনায়নের সুবিধাভোগি হিসেবে তালিকাভুক্তি ও প্রকল্পের আওতায় সামাজিক বনায়নের প্লট প্রাপ্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা, নথিপত্রে স্থানীয় ভূমিহীনদের না দেখিয়ে বাস্তবে প্রভাবশালীদেরকে সামাজিক বনায়নের প্লট বরাদ্দে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট বনকর্মী কর্তৃক আদায় করা হয়।

৪.৮.৪ অর্থ আত্মসাৎ: প্রকল্পের কাজ আংশিক সমাপ্ত করেও ঠিকাদার কর্তৃক পুরো বিল তুলে নিয়ে তা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নীতিনির্ধারকদের একাংশ কর্তৃক বন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতে সম্পৃক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সাবেক একজন মন্ত্রীর নির্দেশে একটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পুরো বিল (অসমাপ্ত কাজের বিলসহ) ঠিকাদারকে প্রদানে বাধ্য হন এবং পরে চাপের মুখে উক্ত কর্মকর্তা চাকরি হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি ও ক্যাম্প পর্যায়ের কর্মীদের বেতন সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক নগদে বণ্টনকালে রেঞ্জ ও ডিএফও এর 'মাসিক খরচ' হিসেবে কার্যালয় প্রতি ৫ - ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কেটে রাখা হয়। ডিএফও এর হিসাব শাখা কর্তৃক ক্ষেত্র বিশেষে বনকর্মীদের দ্বারা উত্তোলিত ভ্রমণ বিল প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ টাকা এবং মোটরযানের মেরামত ও জ্বালানি বাবদ নগদ উত্তোলিত টাকার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কেটে রাখার অভিযোগ রয়েছে।

৫. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বন আইনের (১৯২৭) কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ৯৩ বছরের পুরোনো বন আইনটি আমূল সংস্কারের জন্য কার্যকর উদ্যোগ অনুপস্থিত। বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারহরণ, বন আইন লঙ্ঘন করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ঘোষণাসহ জবরদখল উচ্ছেদের নামে অধিদপ্তরের বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষমতা চর্চার সাম্প্রতিক উদাহরণ রয়েছে। সংরক্ষিত বনভূমির চারপাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ, বনের জমি অবৈধ দখল, বনভূমির জমি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ এবং বনের স্থায়ী ক্ষতিরোধে বন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বন সংরক্ষণ কার্যক্রমকে কম অগ্রাধিকার প্রদান, বননির্ভর রাজস্ব ও আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণসহ অসামঞ্জপূর্ণ ও 'আগ্রাসী' প্রজাতির বৃক্ষের বনায়ন দ্বারা বনের ক্ষতিরোধকল্পে অধিদপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি। এছাড়া বৃক্ষশূন্য প্রাকৃতিক বনের পুনবনায়নের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি এবং এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ও কার্যকর উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যায়। অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডসহ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য অর্জন, বন সংরক্ষণ ও বনায়নকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তার এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি বিদ্যমান। সর্বোপরি, বন অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকাণ্ড কার্যকর তদারকি, পরিবীক্ষণ ও 'ফরেস্ট্রি পারফরমেন্স অডিট' অনুপস্থিতির ফলে বনখাত-কেন্দ্রিক দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

৬. সুপারিশ

আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বন অধিদপ্তরকে একটি সক্ষম ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানের লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে-

১. রাষ্ট্রীয় অতীব জরুরি প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের পূর্বে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ, ত্রুটিমুক্ত ইআইএ সম্পন্নকরণ ও সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করতে হবে।

২. বন আইনের আমূল সংস্কার করে যুগোপযুগী করতে হবে। আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জনঅংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৩. বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

৪. ইতোমধ্যে অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বনের জমিতে সৃজিত সামাজিক বনের গাছ না কেটে মেয়াদউত্তীর্ণ বনসমূহের উপকারভোগীদের মুনাফা প্রদানসহ উক্ত বন প্রাকৃতিক বনে রূপান্তরের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ও বৃক্ষশূন্য জমিতে, যেমন- নতুন চর ও সড়ক-মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ-বান্ধব বনসৃজন করতে হবে।

৬. বন ব্যবস্থাপনায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।

৭. বনকর্মীদের মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও বিভাগভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও পালাক্রমিক বদলির বিধান প্রবর্তন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে সকল পর্যায়ের বন কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিকস সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহে অর্থ বণ্টন ও লেনদেন অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক করতে হবে। এর পাশাপাশি বিট ও অধস্তন কর্মীদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সিএস রেকর্ডকে ভিত্তি ধরে সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিত করতে হবে এবং এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ বনভূমি জবরদখল হয়েছে তার ওপর বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও তা উদ্ধারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. বন সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; ডিএফও ও বন সংরক্ষককে অধিনস্ত কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. বন অধিদপ্তরের বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম নিরীক্ষায় পারফরমেন্স অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এর কার্যকর চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল (যেমন- নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন সংস্থাকে বরাদ্দকৃত ও জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে।

১৫. বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করতে হবে।